

# পদাবলী মাধুর্য

“ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা  
ভবতি ভবাণ্ব-তরণে নৌকা।।”

রায় দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর ডি-লিট

**Published by**

[porua.org](http://porua.org)

---

## পাঁচ সিকা

---

বঙ্গদেশের শিক্ষিতা  
মহিলাগণের মধ্যে যিনি  
কীর্তন প্রচার করিয়া  
এদেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদের  
প্রতি পুনরায় তাঁহাদের  
আন্তরিক অনুরাগ ও শ্রদ্ধা  
জাগাইয়া তুলিয়াছেন,  
জাতীয় জীবনের সেই  
অগ্রগামিনী পথপ্রদর্শিকা  
সুর-ভারতী শ্রীমতী  
অপর্ণা দেবীর কর-কমলে  
স্নেহের সহিত এই  
পুস্তকখানি উৎসর্গ  
করিলাম।

শ্রী দীনেশচন্দ্র সেন

---

## ভূমিকা

এই পুস্তকের শেষ কয়েক ফর্ম্যা যখন ছাপা হয়, তখন আমি কলিকাতায় ছিলাম না। শেষের দিকটার পাণ্ডুলিপি আমি ভাল করিয়া দেখিয়া যাইতে পারি নাই। এজন্য সেই অংশে বহু ভুল-ভ্রান্তি দৃষ্ট হইবে। যদি এই পুস্তকের পুনরায় সংস্করণ করিতে হয়, তখন সেই সকল ভুল থাকিবে না, এই ভরসা দেওয়া ছাড়া এ সম্বন্ধে আর কিছু বলা এখন আমার পক্ষে সম্ভব নহে।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

---

## সাক্ষেতিক শব্দ

চ—চণ্ডীদাস

শে—শেখর

ব—বলরাম দাস

রা—রাম বসু

কৃ—কৃষ্ণকমল গোস্বামী

রায়—রায় শেখর

বৃন্দা—বৃন্দাবন দাস

---

আমার বয়স যখন ১৩ বৎসর, তখন আমার পিতার পুস্তকশালায় চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির একখানি ছাপা পুঁথি আমি পাইয়াছিলাম, ইহা ১৮৭৮ সনের কথা। পিতা ইংরেজীবীশ এবং ব্রাহ্মধর্মের আস্থাবান ছিলেন। সেকালের ব্রাহ্ম-মতাবলম্বীরা চৈতন্য-ধর্মের, বিশেষ করিয়া বংশীধারী কৃষ্ণের বিদ্রোহী ছিলেন। তথাপি আমাদের ঢাকা জেলায় কৃষ্ণকমল গোস্বামী তাঁহার ‘রাই-উন্মাদিনী’ ও ‘স্বপ্ন-বিলাস’ যাত্রায় কৃষ্ণ-প্রেমের যে বন্যা বহাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা তথাকার ব্রাহ্মদিগের আঙ্গিনায়ও ঢুকিয়াছিল,— পৌতলিকের এই বৈপ্লবিক অভিযান তাঁহাদের নিরাকার চৈতন্য-স্বরূপ ব্রহ্ম-বৃহৎ ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই।

আমাদের বাড়ীতে বৈষ্ণব-ভিখারীরা আনাগোনা করিত এবং পিতামহাশয় কখনও কখনও সেই ভিখারীদের মুখে “শুন ব্রজরাজ, স্বপনেতে আজ, দেখা দিয়ে গোপাল কোথায় লুকালো” ইত্যাদি গান শুনিতে ভালোবাসিতেন। আমি সেই কিশোর বয়সে নিবিষ্ট হইয়া সারেঙ্গের সুবের সঙ্গে গায়কের কণ্ঠস্বরের আশ্চর্য্য মিল ও একতান ঝঙ্কার শুনিয়া মুগ্ধ হইতাম। সারেঙ্গ নানা লীলায়িত ছন্দোবন্ধে কখনও ভ্রমরগুঞ্জনের মত, কখন অঙ্গুরী-কণ্ঠ-নির্দিষ্ট সুবে বিনাইয়া বিনাইয়া—মিষ্ট মৃদু তানে “ঝ-ঝ” করিয়া কানে মধু ঢালিয়া দিত, সেই সঙ্গে

“আহা মরি, সহচরি, হয় কি করি, কেন এ কিশোরীর সুশররী প্রভাত হ’ল”-

পদের “রি”গুলি যে কি অদ্ভুত সঙ্গত করিত, তাহা আমি বুঝাইতে পারিব না, মনে হইত, যেন কবি কৃষ্ণকমল কণ্ঠস্বর ও সারেঙ্গের এই অপূর্ব একতান সঙ্গত করিবার জন্যই এই পঞ্চ ‘রি’-বর্ণিত পদটি রচনা করিয়াছিলেন, গানটি যেন সারেঙ্গের মর্ম্মান্ত করুণ সুবের সঙ্গে বিলাপ করিতে থাকত।

আমি ইহাও পূর্ব হইতে বৈষ্ণব-পদের অনুরাগী হইয়াছিলাম আমার অষ্টম বৎসর বয়সে একদিন এক বৃদ্ধ বৈরাগী তাঁহার পাঁচ বৎসর বয়স্ক শিশু পুত্রকে কৃষ্ণ সাজাইয়া একতারা বাজাইয়া মিলিত-কণ্ঠে

“যদি বল শ্যাম হেঁটে যেতে চরণ ধূলায় ধূসর হবে,  
গোপীগণের নয়নজলে চরণ পাখালিবে।”

গাহিতেছিল, সেই আমার প্রথম মনোহরসাই গান শোনা। আমার মনে হইয়াছিল, স্বর্গের হাওয়া আসিয়া আমার বুক জুড়াইয়া গেল;—কেহ যেন এক মুঠো সোণা দিয়া আমাকে আশীষ করিয়া বলিয়া গেল, “এই তোকে রত্নের সন্ধান দিয়া গেলাম।”

এই ঘটনার কিছুদিন পরে মাণিকগঞ্জের বাজারের অনতিদূরে দাসোয়ার খালের কাছে এক চতুর্দশ বৎসর-বয়স্কা রমণী গাহিতেছিল—

“কত কেঁদে মরবি লো তুই শ্যাম অনুরাগে—  
নব-জলধররূপ বড় মনে লাগে—  
ভেবেছিলি যাবে দিন তোর সোহাগে সোহাগে”—

একটা খোলা জায়গায় বাজারের লোকেরা সতরঞ্চি পাতিয়া আসর তৈয়ারী করিয়া দিয়াছিল; বহু শ্রোতা—কেহ দাঁড়াইয়া, কেহ বসিয়া গান শুনিতেন। আমার সেই আট বৎসর বয়সের কথা এখনও মনে আছে। রমণীর বর্ণ গাঢ় কৃষ্ণ, তদপেক্ষা গাঢ়তর কৃষ্ণ কোঁকড়ান কুন্তল পুঞ্জ পুঞ্জ ভ্রমরের মত তাহার পৃষ্ঠে ও কর্ণাশ্রেণীতে ছিল,—সেই কৃষ্ণবর্ণের মধ্যে একটা লাবণ্য ও তাহার সুরে একটা আপনা-ভোলা আবেশ ছিল, তাহা আমি এখনও ভুলিতে পারি নাই—কালেংড়া রাগিণীর চূড়ান্ত মিষ্টত্ব দিয়া সে গাইতেছিল “ভেবেছিলি যাবে দিন তোর সোহাগে—সোহাগে”—এখনও সেই নীল-বরণী নবীনা রমণীর কণ্ঠস্বরের রেশ কখনও কখনও আমার কানে বাজিয়া ওঠে। সে আজ ৬২ বৎসরের কথা; যে তিন ছত্র পদ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা তখনই শুনিয়াছিলাম, তাহা আর শুনি নাই। কত বড় বড় ঘটনা—সুখ-দুঃখ—এই দীর্ঘকাল জীবনের উপর বহিয়া গিয়াছে, তাহাদের স্মৃতি ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে; কিন্তু সায়ংকালে সরিৎস্পৃষ্ট মলয়ানিলে আন্দোলিত নিবিড়-কেশদামশোভিতা নীলোৎপল-নয়নার আকুল কণ্ঠের সেই অসমাপ্ত গীতিকা আমি ভুলিতে পারি নাই। আমার স্মৃতিশক্তি প্রখর, কেহ কেহ একরূপ মত্তব্য করিতে পারেন; কিন্তু তাহা নহে। ঐ পদে আমার প্রাণ যাহা চায় তাহা পাইয়াছিল, এজন্য স্মৃতি তাহা আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়াছে। আমি স্মৃতি অর্থে বুঝি ভালবাসার একটা প্রকাশ; কষ্ট করিয়া রাত জাগিয়া পড়া মুখস্থ করিলে যাহা আয়ত্ত হয় তাহা স্মৃতির ব্যায়ামমাত্র—উহা স্মৃতির স্বরূপ নহে। সন্তান-হারা জননী বিনাইয়া বিনাইয়া মৃত শিশুর জীবনের কত খুঁটি-নাটি কথাই বলিয়া বিলাপ করিয়া থাকেন, শ্রুতিধর কোন স্মার্ত পণ্ডিতেরও হয়ত এত কথা মনে থাকিত না। যাহা ভালবাসা যায়, তাহাই স্মৃতির প্রকৃত খোরাক, তাহা একবার শুনিলে বা দেখিলে আর ভোলা যায় না।

গোড়ায় সুরু করিয়াছিলাম চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির মুদ্রিত পুস্তকের কথা লইয়া। বাবার আলমারীতে জনসনের ব্যাম্বার, এডিসনের স্পেক্টেটর ও থিওডোর পারকারের গ্রন্থাবলীর মধ্যে শিক্ষিত-সমাজের অবজ্ঞাত এই চণ্ডীদাসের পদাবলী কি করিয়া স্থান পাইল? আমি নিশ্চিত বলিতে পারি, বৈষ্ণবগায়কের মুখে দুই একটি ‘স্বপ্ন-বিলাসে’র গান শুনিয়া প্রীত হইলেও, পিতৃদেব চণ্ডীদাসের পদ কখনও পড়েন নাই—তথাপি চণ্ডীদাসের পদাবলী তাঁহার আলমারীতে প্রবেশ করিল কি সূত্রে?

বৈষ্ণব-চূড়ামণি স্বর্গীয় জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় এই পুস্তকখানি সম্পাদন করিয়াছিলেন; শিক্ষিত-সমাজে চণ্ডীদাসের এই সর্ব-প্রথম আবির্ভাব। ভদ্র মহাশয় উত্তর-কালে ত্রিপুরার গর্ভগর্মেণ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষিক হইয়াছিলেন; তখন সেইখানে আমি কতকদিন পড়িয়াছিলাম—কিন্তু

পিতৃদেবের সঙ্গে তাঁহার আলাপ ছিল না। ঢাকা জেলার মত গ্রামবাসী স্বর্গীয় উমাচরণ দাস মহাশয় পিতৃদেবের দূর সম্পর্কে আত্মীয় ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। উমাচরণ দাসের মত ইংরেজী-সাহিত্যবিৎ পণ্ডিত এবং সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি তখন পূর্ববঙ্গে কেহ ছিলেন না। ভদ্র মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত চণ্ডীদাসের ভূমিকায় বিশেষ করিয়া ইহার কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন, উমাচরণবাবু তাঁহার অগ্রজপ্রতিম ছিলেন এবং তাঁহার পূর্ণ সাহায্য ভিন্ন তিনি পুস্তকখানি সম্পাদন করিতে পারিতেন না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, উমাচরণবাবু সেকালের ইংরেজী-জানা শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয় হইলেও, গ্রাম্যকবি চণ্ডীদাসের অনুরাগী ছিলেন। পিতামহাশয়কে উমাচরণবাবুই চণ্ডীদাসের পদাবলী উপহার দিয়া থাকিবেন।

এইভাবে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় এবং পদাবলী-সাহিত্যে আমার প্রথম প্রবেশ। আমি বইখানি আদৃত পড়িলাম। ১২।১৩ বৎসর বয়সেই আমি বাইরণ ও শেলীর কাব্য, এমন কি মিস্টনের প্যারাডাইস লস্ট লইয়াও নাড়াচাড়া করিতাম। আমার শিক্ষক পূর্ণচন্দ্র সেন আমাকে বিদ্যাপতির পদ পড়িয়া শুনাইতেন। তিনি প্রথমতঃ ব্রাহ্ম ছিলেন, তার পর উল্টা খোঁজ দিয়া একবারে গোঁড়া হিন্দু হইয়াছিলেন। তিনি সর্বপ্রথম আমাকে বলেন—এই বৈষ্ণব-কবিদের ভাব আধ্যাত্মিক জীবনের গূঢ় রহস্যপূর্ণ। তিনি অবশ্য বৈষ্ণব-কবিদের ভাব কতকটা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, কারণ “নিজ করে ধরি দুঁহ কানুক হাত। যতনে ধরিল ধনি আপনার মাথ” প্রভৃতি পদ পড়িতে পড়িতে তিনি আবিষ্ট হইয়া পড়িতেন। কিন্তু স্কুলে ছিলেন শাক্তের অবতার—সাক্ষাৎ মায়ের মূর্তি; আমরা সকলেই তাঁহার প্রহারে জর্জরিত হইয়াছি।

কৈশোরাব্ধে যখন আমার জীবনে নব অনুরাগের ছোঁয়াচ লাগিয়াছিল, তখনও বৈষ্ণব পদ আমি ভোগের রাজ্যের অভিধান দিয়া বুঝি না—ইহা পূর্ণবাবুর কৃপায়।

## ২। “এ কথা কহিবে সই এ কথা কহিবে”

আমি নিবিষ্ট হইয়া চণ্ডীদাসের পদাবলী পড়িতাম।—বটতলার পদকল্পতরু কিনিয়া লইলাম। ধীরে ধীরে এই গানটিতে আমার মনে একটা নূতন রাজ্যের দরজা খুলিয়া গেল:—

“এ কথা কহিবে সই এ কথা কহিবে,  
অবলা এমন তপঃ করিয়াছে কবে?  
পুরুষ-পরশমণি নন্দের কুমার,  
কি ধন লাগিয়া ধরে চরণে আমার।”

তিনি স্পর্শ-মণি, যাহা ছুঁইয়া ফেলেন, তাহাই সোণা হইয়া যায়; এমন ধনী তিনি, কুবেরও তাঁহার কাছে ধন প্রার্থনা করেন, সেই কৃষ্ণ কি ধনের প্রত্যাশায় আমার পা ধরিয়া থাকেন, সখীগণ তোমরা বল, আমার মত তপস্যা কে করিয়াছে?—একুপ অসাধনে সিদ্ধি আমি কি করিয়া লাভ করিলাম!

সাধকের চক্ষে বিশ্বের সকলই ভাগবত-মূর্তি—তাঁহারই প্রকাশ। স্ত্রী-পুত্র-পরিবার, যাঁহারা নিবিড় স্নেহ দ্বারা আমাকে বাঁধিতেছেন, তাঁহারা ভাগবত শক্তি, তাঁহারা কি নিত্যই চরণ ধরিয়া আমার সেবার জন্য, আমায় সাধিতেছেন না? এমন তপস্যা আমি কি করিয়াছি, তিনি সেবা দিয়া নিরন্তর আমাকে আকর্ষণ করিতেছেন! যিনি বহুর মধ্যে কেবল এককে চিনিয়াছেন, এবং শত হস্তের সেবার মধ্যে সেই কর-কমল দুইটির পরশ পাইয়াছেন, তিনিই বলিতে পারেন—

“পুরুষ পরশমণি নন্দের কুমার,  
কি ধন লাগিয়া ধরে চরণে আমার!”

এই পদের পরের পদগুলি এইরূপ:—

“আমি যাই-যাই-যাই বলে’ তিন বোল।  
কত না চুম্বন দেয়, কত দেহি কোল।  
পদ আধ যায় পিয়া, চায় পালটিয়া,  
বরান নিরখে কত কাতর হইয়া।” (চ)

কি অপার্থিব দৃশ্য! বিদায়কালে চিবুক ধরিয়া কৃষ্ণ “যাই” “যাই” বলিতেছেন; “যাই” বলিলেই চলিয়া যাইতে পারেন না, রাখার মুখখানি তাঁহাকে ধরিয়া রাখে। পুনরায় “যাই” বলিয়া বিদায় চান—প্রতিবারই ফিরিয়া আসিয়া সোাগাগ করেন, আধ পা যাইয়া ফিরিয়া ফিরিয়া চান এবং কাতর-দৃষ্টি মুখখানির প্রতি আবদ্ধ করিয়া থামিয়া দাঁড়ান, সে মুখ যে কোন কেন্দ্রীয়

শক্তি দ্বারা তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ ফিরাইয়া আনে! এই অসাধনের ধন পাইয়া কি ফেলিয়া যাইতে ইচ্ছা হয়? কিন্তু যাইতে তো হইবেই; যদি সত্যই অঞ্চলের নিধি হারাইয়া যায়, যদি আবার না দেখিতে পান, তবে বাঁচিবেন কেমন করিয়া?

“করে কর ধরি পিয়া শপথি দেয় মোরে।  
পুন দরশন লাগি কত চাটু বোলে।”

“রলযোরভেদস্বাং”—‘মোরে’ ও ‘বোলে’র গরমিল পাঠক ধরিবেন না। এগুলি গান, কাব্যের নিয়ম এখানে সর্বদা চলে না।

তিনি হাত ধরিয়া শপথ চাহিতেছেন, “আমার হাত ছুঁইয়া বল, আবার দেখা পাব”—যে দর্শন সমস্ত সাধনার শেষ সিদ্ধি, সহস্র কষ্টের উপশম, ভবরোগের শ্রেষ্ঠ ভেষজ—সেই দর্শনের জন্য ভিক্ষা।

সেই সনাতন ভিখারী জীবকে এমনই করিয়া চান। হে মানব! তোমার দেবতা তোমাকে এমন করিয়া চান, মাতার উৎকর্ষার মধ্যে, স্বামীস্নেহের সোহাগে, শিশুর ব্যাকুলতার মধ্যে সেই চিরন্তন ভিখারী এমনই করিয়া বারম্বার তোমার কাছে হাত পাতিয়া আছেন—তোমার চোখের মায়ায় ঢাকনিটা খুলিয়া দেখিতে চাহিলে সেই প্রেম-ভিক্ষকের এই চিত্রই দেখিতে পাইবে। করে তোমাকে পাইব—এইজন্য তিনি কাকুবাদ করিয়া শপথ চাহিতেছেন।



## ৩। কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম

চণ্ডীদাসের একটি কবিতা, যাহা সচরাচর চণ্ডীদাসের পদাবলীতে মুখবন্ধস্বরূপ প্রথমে স্থান পাইয়া থাকে, এখানে সেইটির উল্লেখ করিব। কেহ কেহ এই পদটির মধ্যে শ্লীলতার অভাব দেখিয়াছেন। এমন লোকও আছেন, যাঁহাদের কাছে কালীঘাটের কর্দমাক্ত গঙ্গাজলও পবিত্রতার খনি। আমি বৈষ্ণব-কবিতাগুলি যে ভাবে পড়িয়াছি, যে চক্ষে দেখিয়াছি, তন্ভাবে ভাবিত লোক ছাড়া আমি সে চক্ষু অপরকে দিব কি করিয়া? যাঁহারা আমার ভাবে এই পদগুলি বুঝিবেন না, তাঁহাদিগকে বুঝাইবার সাধ্য আমার নাই। তাঁহাদের নিকট আমার এই অনুরোধ, তাঁহারা যেন শেলী পড়েন, কীটস্ পড়েন, বৈষ্ণব পদ পড়িয়া তাঁহাদের কোন লাভই হইবে না, অথচ হয় ত এমন কথা বলিয়া ফেলিবেন, যাহাতে অহেতুকভাবে অপরের প্রাণে ব্যথা লাগিতে পারে।

আমি “সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম” গানটির কথাই বলিতেছিলাম।

পার্থিব প্রেম ও ইন্দ্রিয়াতীত প্রেম—এই দুইয়ের মধ্যে একটা তফাৎ থাকিলেও, সাংসারিক প্রেমের মধ্য দিয়া এমন একটা সন্ধিস্থলে পৌঁছান যায়—যেখানে যেরূপ আকাশ ও পৃথিবী দিগ্বলয়ে পরস্পরকে ছুঁইয়া ফেলে, সেইরূপ পার্থিব ও অপার্থিব প্রেমের সেখানে দেখাদেখি হয়; গাছের ডালটারে আশ্রয় করিয়া যেরূপ স্বর্গের ফুল ফুটে, এই প্রেম সেই ভাবে জড়রাজ্য হইতে আনন্দলোক দেখাইয়া থাকে। কোন নায়ক-নায়িকা নাম জপ করিয়াছে, এমন তো বড় দেখা যায় না। তবে যাহাকে ভালবাসা যায়, তাহার নামটি যে মিষ্ট লাগে—তাহার উদাহরণ সাধারণ-সাহিত্যে একেবারে দুর্লভ নহে! বঙ্কিমচন্দ্রের কুন্দ নগেন্দ্রের নামটিতে সেইরূপ মিষ্টত্ব আবিষ্কার করিয়া সংগোপনে অতি সন্তপণে ‘নগ’ ‘নগ’ ‘নগেন্দ্র’ এই অর্ধস্মৃতি শব্দগুলি উচ্চারণ করিয়াছিল। অর্দ্ধোদগত কুসুম-কোরকের ন্যায় এই নাম লইতে যাইয়া তাহার ব্রীড়াশীল কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। বৈষ্ণব পদ-মাধুর্য্যের এখানে একটু আভাষ পাওয়া যায় মাত্র।

কিন্তু ভাগবত-রাজ্যে নামই মুখ-বন্ধ। এ পথের নূতন পাত্র প্রথম প্রথম বিব্রত হইয়া পড়িবেন; নাম করিতে যাইয়া দেখিবেন, সাংসারিক চিন্তার নানা জটিল ব্যুহ তাঁহাকে ঘিরিয়ে ধরিয়াছে,—করাঙ্গুলীর সঙ্গে মালা ঘুরিতেছে, কিন্তু দুই এক মিনিট পরে পরেই অসতর্ক মন সংসারের নানা কথায় নিজকে জড়াইয়া ফেলিয়াছে। তখন তিনি সাবধান হইয়া মনকে শুধু নামের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার সঙ্কল্প করিবেন। পুনরায় দেখিবেন, সাংসারিক চিন্তা, সন্তানের পীড়া, মোকদ্দমার কথা, অর্থাগমনের উপায় প্রভৃতি বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে মন চলিয়া যাইতেছে—এ যেন কাঁঠালের আঠা, ছাড়াইতে চাহিলেও ছাড়াইতে পারা যায় না।

কিন্তু দৃঢ়সংকল্প-দ্বারা অসাধ্যসাধন হয়। ধীরে ধীরে মনের আবর্জনা দূর হইতে থাকে। পৌষের কুয়াশা কাটিয়া গেলে প্রাতঃসূর্য্যোদয়ের মত ক্রমে ক্রমে নামের মহিমা প্রকাশ পায়। এইভাবে মন স্থিত হইলে, ইন্দ্রিয়-বিকার থামিয়া গেলে, নাম আনন্দের স্বরূপ হইয়া অপার্থিব-রাজ্যের বার্তা বহন করে। নামের এই অপরূপ আশ্বাদ কতদিনে মানুষ পাইতে পারে জানি না, ইহা সাধনা ও যুগ-যুগের তপস্যা-সাপেক্ষ।

তখন নাম শোনা মাত্র উহা মর্মে মর্মে প্রবেশ করে, কাণ জুড়াইয়া যায়—প্রাণ জুড়াইয়া যায়। প্রেমিক তখন পৃথিবী ভুলিয়া নামের পোতাশ্রয়ে নঙ্গড় বাঁধেন। সেস্থান শুধু নিরাপদ ও নিৰ্বিঘ্ন নহে—তাহার মোহিনীতে মন মুগ্ধ হইয়া যায়।

“সই, কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম।  
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো—  
আকুল করিল মোর প্রাণ।”

কত তিলোত্তমা, কত রজনী, কত বিনোদিনী ও রাজ-লক্ষ্মীর প্রেমের কথা কবিরা আপনাদিগকে শুনাইয়াছেন, আপনারা সীতা-সাবিত্রী-দয়মন্তীর কথা শুনিয়াছেন;—কিন্তু এইরূপ না দেখিয়া নামের “বেড়াজালে” পড়িতে আর কাহাকেও দেখিয়াছেন কি? শুধু নাম শোনা নহে, নাম-জপ। “জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো”—নাম জপ করিতে করিতে ইন্দ্রিয়গুলির সাড়া থামিয়া যায়—যে রূপ হাটের কলরব দূর হইতে শোনা যায়, কিন্তু হাটের মধ্যে আসিলে আর সে কলরব শোনা যায় না। জপ করিতে করিতে বহিরিন্দ্রিয়ের ক্রিয়া থামিয়া যায়—“অবশ করিল গো”—কথায় ইন্দ্রিয়াতীত অবস্থার কথাই আমি বুঝিয়াছি।

বঙ্গীয় জনসাধারণের সঙ্গে আমাদের এইখানে নাড়ীচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে। তাহাদের মনোভাব এখনও এইরূপ অর্থগ্রহণের অনুকূল আছে, বিদেশী শিক্ষার গুণে আমরা খনির কাছে থাকিয়াও মণির সন্ধান লইতে ভুলিয়া গিয়াছি।

নাম শুনিয়াই অঙ্গ এলাইয়া পড়িয়াছে, মন বেহুঁস্ হইয়া সেই নামরূপী ভগবানের দিকে ছুটিয়াছে। তিনি কে, যিনি শুধু নাম দিয়াই আমার মন হরণ করিয়াছেন? আমার বিদ্রোহী ইন্দ্রিয়গুলি আগুনের মত জ্বালা উৎপাদন করিতেছিল, সেই অগ্নিকুণ্ডে শুধু নামের গুণেই যেন বারি বর্ষিত হইল—সকল জ্বালা, সকল তাপ জুড়াইয়া গেল।

এখন তাঁহাকে কি করিয়া পাইব? তিনি কে, কেমন করিয়া জানিব? ফুলের মালা হাতে করিয়া আছি, কাহাকে পরাইব?

“নাম-পরতাপে যার ঐছন করল গো  
অঙ্গের পরশে কিবা হয়!”